Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সারাবিশ্বে মানবাধিকার কমিশনের ব্যর্থতা ও ভয়াবহ নিষ্ক্রিয়তা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মাহফুজা আক্তার

রোলঃ 23090121325

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সারাবিশ্বে মানবাধিকার কমিশনের ব্যর্থতা ও ভয়াবহ নিস্ক্রিয়তা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মাহফুজা আক্তার

রোলঃ 23090121325

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সারাবিশ্বে মানবাধিকার কমিশনের ব্যর্থতা ও ভয়াবহ নিষ্ক্রিয়তা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মাহফুজা আক্তার, আইডিঃ 23090121325 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সারাবিশ্বে মানবাধিকার কমিশনের ব্যর্থতা ও ভয়াবহ নিস্ক্রিয়তা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

মাহফুজা আক্তার

আইডিঃ 23090121325

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 1

ইসলাম ও পাশ্চাত্য 2

পশ্চিমের গুরুতর ভুল 5

দীনের মৌলিক বক্তব্য 5

সেকুলার চিন্তার মৌলিক বক্তব্য 8

ইসলামপন্থী কিছু ব্যক্তির আপসপ্রবণ মনোভাব 8

ধর্মহীনতার গোপন ভিত্তি 9

বৈষয়িক গুরুত্ব ও ভয়াবহতা 9

ইসলামের দৃষ্টিকোণ 10

মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক সনদ: এখনো অসম্পূর্ণ ও অপূর্ণ 18

ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার অধিকার 21

ধর্মীয় স্বাধীনতা 22

নিরাপত্তার অধিকার 25

শিক্ষার অধিকার 28

সমতার অধিকার 30

মতপ্রকাশের অধিকার 31

শেষকথা 33

সারা বিশ্বে মানবাধিকার কমিশনের ব্যর্থতা ও ভয়াবহ নিষ্ক্রিয়তা

۞ *اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَّارْزُقْنَا اتِّبَاعَهٗ، وَاَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَّارْزُقْنَا اجْتِنَابَهٗ*

- হে আল্লাহ, আপনি হককে হক হিসেবে আমাদের দেখান এবং এর অনুসরণের তাওফীক দিন, আর বাতিলকে বাতিল হিসেবে দেখান এবং এটাকে পরিত্যাগ করার তাওফীক দিন।

[তাফসীরে ইবনে কাসীর ১/৫৯০; সূরা বাকারার ২১৩ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য]

ভূমিকা

: "মানবাধিকার" শব্দটি দ্বারা মূলত মানুষের অধিকার এবং মর্যাদা রক্ষার বিষয়টা উল্লেখ করে। মানবাধিকার একটি ক্রম পরিবর্তনশীল চিন্তা। কালের পরিক্রমা এবং অঞ্চল ভেদেও এটি ভিন্ন হতে পারে।

ইসলামের দৃষ্টিতে "মানবাধিকার" শব্দটিকে শাব্দিক অর্থের দিক থেকে "হক্কুল ইবাদ" (বান্দার অধিকার) -এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ মনে হতে পারে কিন্তু পারিভাষিক অর্থের দিক থেকে এই বিষয় দুটি ভিন্ন । সাম্প্রতিককালে পশ্চিমা সভ্যতার প্রসব করা "মানবাধিকার" শব্দটি দ্বারা যে কথিত 'মুক্তি' ও 'স্বাধীনতা' -র ধারণা মানুষের সামনে উপস্থাপন করছে তা ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি এবং চিন্তাধারার সঙ্গে চরমভাবে সংঘর্ষপূর্ণ।

বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে- শুধুমাত্র সামাজিক চুক্তি বা রাষ্ট্রীয় আইন কখনোই স্থায়ী নিরাপত্তা দিতে পারে না। অন্যের অধিকার লঙ্ঘন থেকে নিজেকে বিরত রাখতে দৃঢ় নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিক ভিত্তি অধিক শক্তিশালী। যা ইসলামের পূর্ণাঙ্গ নীতি এবং সুশৃংখলার মাধ্যমে মানবজাতির সামনে উপস্থাপিত হয়েছে।

জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকারসমূহ - ব্যক্তি স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, নিরাপত্তার অধিকার, শিক্ষার অধিকার, মত প্রকাশের অধিকার, সমতার অধিকার ইত্যাদি বিষয় গুলো ইসলামের মূলনীতির আলোকে ক্ষুদ্র আকারে পর্যালোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে এই থিসিস পেপারে।

এই থিসিস পেপারে সাবলীলভাবে এই প্রাথমিক দিশা দেওয়া হয়েছে যে- ইসলামে স্বীকৃত ও প্রকৃতিগত মানবাধিকার; জাতিসংঘ ঘোষিত অধিকারের তুলনায় অধিক ঊর্ধ্বতন, পরিপূর্ণ ও সুশৃংখল এবং মানবাধিকার কমিশন রচিত তথাকথিত অধিকারগুলো সুশৃঙ্খল ভাবে

বাস্তবায়ন করতে জাতিসংঘ নিশ্চল এবং ব্যর্থ হয়েছে। পাশাপাশি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সমাজে বর্ণ, ধর্ম,লিঙ্গ, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদিতে বৈষম্য সৃষ্টি করেছে।
নিরপেক্ষ মনোভাব নিয়ে কোরআনের আয়াত ও হাদিসের বাণীগুলোকে আমরা উপলব্ধি করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

এই থিসিস পেপারটা লিখতে সাদিক ফারহানের সংকলন ও পরীমর্জনায় রচিত "হিউম্যান রাইটস" বইটির সাহায্য নেওয়া হয়েছে । যদি সম্ভব হয় পাঠককে সম্পূর্ণ বইটি পড়ার অনুরোধ জানাচ্ছি। বইটিতে লেখক আরো সহজবোধ্য, হৃদয়গ্রাহী ও প্রাসঙ্গিকভাবে বিষয়গুলোকে উপস্থাপন করেছেন। আমার কৃত ভুলগুলোকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন।
আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলের ইলমে ও আমলে অনেক বারাকাহ দান করুন এবং আমাদেরকে ঈমান, ইসলাম ও হেদায়েতের উপর ইস্তেকামাত দান করুন।

ইসলাম ও পাশ্চাত্য

মানবাধিকারের মৌলিক পার্থক্য

ইসলাম ও পাশ্চাত্য মানবাধিকার ধারণার মধ্যে দুইটি মূল পার্থক্য সুস্পষ্ট:

১. নাগরিক ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক:

পাশ্চাত্যে মানবাধিকার মূলত নাগরিক ও রাষ্ট্রের মধ্যকার সম্পর্ককে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। রাষ্ট্রের সীমাহীন ক্ষমতার বিপরীতে নাগরিকের কতিপয় নির্ধারিত অধিকার প্রতিষ্ঠাই এর মূল উদ্দেশ্য। তাই এখানে নাগরিক ও রাষ্ট্র একে অপরের প্রতিপক্ষ হিসেবে বিবেচিত হয় এবং সংবিধান যেন এ দুই পক্ষের মধ্যে একটি চুক্তিপত্র রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

কিন্তু ইসলামে নাগরিক ও রাষ্ট্র উভয়ই আল্লাহ তাআলার প্রতি আনুগত্যে আবদ্ধ সমান একক সত্তা। এখানে না নাগরিকের অধিকার রাষ্ট্রের দয়ার উপর নির্ভরশীল, না রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব

নাগরিকের স্বীকৃতির উপর নির্ভর করে। বরং উভয়ই আল্লাহর বিধানের অধীন, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই তাদের সম্মিলিত কর্তব্য। (১)

২. সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের উৎস:

পাশ্চাত্যে সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব মানুষের মধ্য থেকেই গঠিত হয়-একটি গোষ্ঠী শাসক শ্রেণী হয়ে ওঠে, অপর অংশ থাকে শাসিত। পক্ষান্তরে, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহ তাআলার। মানুষ কেবল তাঁর প্রতিনিধি বা খলিফা হিসেবে ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার পায়। প্রত্যেক ব্যক্তি-শাসক কিংবা শাসিত— আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মানার ক্ষেত্রে সমানভাবে দায়বদ্ধ।

(১) Md. Salahud Din: Bunyadi Huquq P. ২৭

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন:

- *مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ : أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُون*

"তাঁকে ছেড়ে তোমরা যার ইবাদত করছ, তার সারবত্তা কতগুলো নামের বেশি কিছু নয়, যা তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদাগণ রেখে দিয়েছে। আল্লাহ তার পক্ষে কোনও দলীল নাযিল করেননি। হুকুম দানের ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নেই। তিনিই এ হুকুম দিয়েছেন যে, তোমরা তা ভিন্ন অন্য কারও ইবাদত করো না। এটাই সরল-সোজা পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।"(১)

- *وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا*

"বল, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি, তাঁর রাজত্বে কোন অংশীদার নেই এবং অক্ষমতা হতে রক্ষার জন্য তাঁর কোন অভিভাবকের প্রয়োজন নেই। তাঁর মহিমা বর্ণনা কর, ঠিক যেভাবে তাঁর মহিমা বর্ণনা করা উচিত।"(২)

- *وَلَا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ*

"আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন মাবুদকেও ডেকো না। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। সবকিছুই ধ্বংশীল, কেবল আল্লাহর সত্তাই ব্যতিক্রম। শাসন কেবল তাঁরই এবং তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।"(*)

- *لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى*

এ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে এবং যা-কিছু আছে এ দুয়ের মাঝখানে, সব তাঁরই মালিকানধীন। আর যা-কিছু ভূগর্ভে আছে তাও।(*)

(১) সূরা ইউসুফ ১২:৪০

(২) সূরা আল-ইসরা ১৭:১১১

(৩) সূরা সোয়াদ ৩৮:৮৮

(৪) সূরা তহা, আয়াত: ৬

- *إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ، وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا*

নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি সত্য-সম্বলিত কিতাব নাযিল করেছি, যাতে আল্লাহ তোমাকে যে উপলব্ধি দিয়েছেন, সে অনুযায়ী মানুষের মধ্যে মীমাংসা করতে পার। আর তুমি খেয়ানতকারীদের পক্ষ অবলম্বন করো না।(১)

পশ্চিমের গুরুতর ভুল

পশ্চিমা সভ্যতার সবচেয়ে মারাত্মক ও গুরুতর ভুল হলো, তারা মানবজীবনের সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব তার নিজের বা অন্য কোনো মানুষের হাতে অর্পণ করেছে। অথচ বাস্তবতা হলো, মানুষ যতই জ্ঞানী, যতই ন্যায়নিষ্ঠ হোক, তার চিন্তা, অভিজ্ঞতা ও বিচার-বুদ্ধি সর্বদা সীমাবদ্ধ ও পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে থাকে। ফলে তার তৈরি আইন কখনোই সব মানুষের প্রতি সমান ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে পারে না।

কিন্তু সমগ্র জাহানের মালিক মহান আল্লাহ তাআলা-যিনি সকল সীমার ঊর্ধ্বে, যিনি সবকিছু জানেন এবং প্রতিটি বান্দাকে ভালোবাসেন-তাঁর পক্ষেই একমাত্র সত্য ও পূর্ণাঙ্গ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। তাঁরই প্রদত্ত বিধান প্রকৃত মানবাধিকার হিসেবে চূড়ান্ত। পবিত্র কুরআনে তিনি ইরশাদ করেছেন:

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ، وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

এ "আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাজিল করেছি, যাতে তুমি মানুষের মধ্যে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী বিচার করতে পারো।" (২)

(১) সূরা ইসরা, আয়াত: ১০৫

(২) সূরা আন-নিসা ৪:১০৫

দীনের মৌলিক বক্তব্য

ইসলামসহ প্রতিটি ইলহামী ধর্মের মৌলিক বক্তব্য এই যে, মানুষ এই জগতে নিজে নিজে উদ্ভূত হয়নি, আর তার সৃষ্টি উদ্দেশ্যহীন কিংবা বৃথাও নয়। বরং এক মহান সত্তা মহান কোনো উদ্দেশ্যে তাকে সৃষ্টি করেছেন। সেই মহান উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ এই দুনিয়ায় তার রবের ইবাদত করুক, তার বিধান ও নির্দেশকে নিঃশর্তভাবে গ্রহণ করবে এবং নিজের সকল সামর্থ্য ও সক্ষমতা সেই সত্তার ইচ্ছা ও বিধান অনুযায়ী কাজে লাগাবে।

মানবজাতির স্রষ্টা তার পক্ষ থেকে নির্দেশনা ও শিক্ষা পৌঁছাতে যুগে যুগে নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। তারা মানুষকে জানান সেই পথ, যা স্রষ্টার পছন্দ ও অপছন্দকে স্পষ্ট করে এবং এ ঐশী তরিকায় সংকলিত জীবনবিধানই 'দীন' বা 'ধর্ম' নামে পরিচিত।

অতএব:

(ক) এই পৃথিবীতে মানুষের পরিচয় একমাত্র স্রষ্টার বান্দা হিসেবে। তার একমাত্র দায়িত্ব হলো, সে প্রভুর বান্দা হয়ে জীবন যাপন করবে, তাঁর দানকৃত নিয়ামত ও ক্ষমতাসমূহকে তাঁর বিধানের আলোকে ব্যবহার করে পরকাল গোছাবে। কুরআন এই সত্যকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর মর্মবাহী ভাষায় প্রকাশ করে বলেছে:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون

আমি জিন ও মানবজাতিকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। (১)

(খ) মানুষের এই দুনিয়ায় আসা ও থাকা চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়, বরং এ জীবনের পরবর্তী একটি জগত রয়েছে, যা মানবজাতির প্রকৃত গন্তব্য। সবাইকেই একদিন সেখানে পৌঁছাতে হবে এবং সেখানে প্রত্যেককে তার প্রভুর সামনে জবাবদিহির জন্য হাজির নি হতে হবে। এই জাগতিক জীবনের মূল উদ্দেশ্য হলো, সেই চিরস্থায়ী জীবনের সফলতার জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

(গ) পার্থিব উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহার একটা পর্যায় পর্যন্ত মানুষের প্রয়োজন হলেও, বস্তুগত উন্নতিই তার জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়। এই জগতে তার উন্নতি ও ব্যর্থতা, কিংবা মানবীয় উৎকর্ষ ও অধঃপতনের মাপকাঠি কেবল বৈষয়িক সাফল্য নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ- وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ- وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُور

প্রতিটি প্রাণ মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে। আর কিয়ামতের দিনই তোমাদের প্রতিদান পূর্ণরূপে দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে রক্ষা পেল এবং জান্নাতে প্রবেশ করল, সে-ই সফলকাম। এই দুনিয়ার জীবন তো ধোঁকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়। (২)

(১) সূরা যারিয়াত, আয়াত: ৫৬

(২) সূরা আলে-ইমরান, আয়াত: ১৮৫

অন্যত্র ঘোষণা করা হয়েছে:

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

তোমরা কি মনে করেছিলে, আমি তোমাদের বৃথা সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে না?(১)

আরও বলা হয়েছে:

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه)

যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ ভালো কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে। আর যে অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে, সেও তা প্রত্যক্ষ করবে। (২)

(১) সূরা মুমিনুন, আয়াত: ১১৬

(২) সূরা যিলযাল, আয়াত: ৭-৮

সেকুলার চিন্তার মৌলিক বক্তব্য

সমসাময়িক নাস্তিক্যবাদী, সেক্যুলার ও ধর্মহীন দৃষ্টিভঙ্গির মূল বক্তব্য এই যে, মানুষ কোনো অদৃশ্য সত্তার সৃষ্ট নয়, এবং রবের কোনো বিধান বা নির্দেশনা তাকে মানতে বাধ্য করা যায় না। সুতরাং মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য আল্লাহর দাসত্ব নয়, বরং নিজের ইচ্ছামতো জীবন যাপন করাই তার পরম সৌভাগ্য।

সে স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করে এবং সেই স্বাধীনতা নিয়েই বেঁচে থাকা তার জন্মগত অধিকার। মানবসমাজ যদি পার্থিব কল্যাণ বিবেচনায় কোনো নিয়ম তৈরি করে, তবে সেটি বাধ্যতামূলক হতে পারে; কিন্তু কোনো অলৌকিক বা পরজাগতিক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তার ইচ্ছা বা স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হলে, সেটি তার অবমাননা ও অধিকারহরণ বলে বিবেচিত হয়।

ইসলামপন্থী কিছু ব্যক্তির আপসপ্রবণ মনোভাব

এ বিষয়ে ইসলামপন্থী বা মুসলমানদের কিছু শ্রেণির মনোভাবে যে 'আপস' বা 'সমঝোতার' ধারা দেখা যায়, তার মূল কারণ মানসিকভাবে প্রভাবিত ও পরাজিত হয়ে পড়া। বিশেষ করে পাশ্চাত্যের চমকপ্রদ প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও দৃষ্টিনন্দন উন্নতির ফলে অনেকেই মনে-প্রাণে তাদের প্রতি মুগ্ধ ও পরাভূত। উপনিবেশিত জাতির মনস্তত্ত্বে যেমন এক প্রকার হীনম্মন্যতা জন্ম নেয়, এখানেও তেমনটি দেখা যায়। তারা মনে করে, পাশ্চাত্যই যেন উন্নতি ও সম্মানের চূড়ান্ত মানদণ্ড। ফলে তারা তাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি, অভ্যাস, জীবনধারা, প্রশাসনিক কৌশল, এমনকি চিন্তাভাবনা ও দর্শনের সঙ্গেও সমঝোতার সুর বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে।

আর যদি কখনও তাদের নিজস্ব ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে পাশ্চাত্যের শিক্ষাব্যবস্থার সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়, তখনও তারা ইসলামি শিক্ষাকে পাশ্চাত্য চিন্তার মোড়কে উপস্থাপন করতে সচেষ্ট হয়। তারা সাধারণত মুখে এসব বলে না, কিন্তু তাদের চিন্তাধারা ও কার্যকলাপে এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পাশ্চাত্যই উন্নতি, সম্মান ও সফলতার একমাত্র ছাঁচ, এবং যে কোনো জাতি বা উম্মত ততদিন সফলতা ও মর্যাদা অর্জন করতে পারবে না, যতদিন না সেই ছাঁচে নিজেকে ঢেলে নিতে পারবে।

ধর্মহীনতার গোপন ভিত্তি

বিদ্যমান দুনিয়ায় সমগ্র মানবজাতির মাঝে যে লুটপাট, রক্তপাত, নিষ্ঠুরতা, মিথ্যাচার, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, অজ্ঞতা, কর্মহীনতা, সামাজিক ও নৈতিক দুর্যোগের ভয়াবহ বিস্তার দেখা দিয়েছে-তা মানবজাতিকে এমন এক দুর্বিষহ দুঃস্বপ্নের জালে বন্দি করেছে, যেখানে মানুষ নিজের অস্তিত্বের প্রতিই বিতৃষ্ণ হয়ে পড়েছে। দার্শনিক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা এই দুর্দশার নানা কারণ তুলে ধরেন। যদিও একটি ঘটনার একাধিক কারণ থাকা অসম্ভব নয়, তথাপি আমাদের দৃষ্টিতে এর মূল ও মৌলিক কারণ হচ্ছে ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, ধর্মহীনতার প্রতি মোহ, এবং পথনির্দেশ ও শিক্ষার প্রতি বিমুখতা।

বিশ্বের এই কার্যকারণভিত্তিক ব্যবস্থায় কোনো কিছুই নিছক 'কারণহীন' নয়। বরং প্রতিটি কারণের পেছনেও অন্য কোনো গভীর কারণ সক্রিয় থাকে। তেমনি এই ধর্মবিমুখ সামাজিক প্রবণতাও স্রেফ কাকতালীয় নয়। এর পেছনেও কিছু শক্তিশালী কারণ সক্রিয় রয়েছে, যেগুলো মানুষকে ক্রমাগত এই পথেই ঠেলে দিচ্ছে।

এই সব কারণের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো-"মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদ", যা ডিসেম্বর ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয়। এটি বহু ধারাবিবরণী ও আইনি পরিভাষার একটি যৌগিক দলিল, যা আজকাল বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রে স্বীকৃত ও মৌলিক অধিকারের ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়।

বৈষয়িক গুরুত্ব ও ভয়াবহতা

এই ঘোষণাপত্র নিয়ে আমাদের উম্মতের জ্ঞানীজন ও লেখকসমাজ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ও বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু যার জন্য হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটে, তা হলো-এই বিশ্লেষণের বেশিরভাগই পাশ্চাত্য চিন্তার প্রভাবে পরিচালিত। ঘোষণার যেসব ধারা ইসলামী শিক্ষার সঙ্গে সরাসরি সাংঘর্ষিক, সেগুলোর ক্ষেত্রে অনেকে দুঃখজনকভাবে মীমাংসার পথ খোঁজেন কিংবা ইসলামি শিক্ষাকে এই ঘোষণার ভাষা ও ভাবের সঙ্গে খাপ খাইয়ে উপস্থাপন করতে চান। কেউ কেউ এই ঘোষণার সুসজ্জিত ও মনোমুগ্ধকর শব্দবন্ধ দেখে কুরআন-সুন্নাহ থেকে এর সমর্থনে দলিল খোঁজার প্রয়াসে মেতে ওঠেন।।

তাই, এসবের প্রকৃত অর্থ অনুসন্ধান ও ইসলামের আলোকে তার বাস্তবতা উপস্থাপনের জরুরত সীমাহীন। আমরা তো বিশ্বাস করি, পৃথিবীর চিহ্নিত কিছু রাষ্ট্র তাদের মনগড়া চাহিদা ও স্বার্থ পূরণের লক্ষ্যে এটি তৈরি করেছে এবং একে 'মৌলিক মানবাধিকার' নাম দিয়ে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে।

ইসলামের দৃষ্টিকোণ

১. মনিবাধিকার ও হক্কুল ইবাদ' (বান্দার অধিকার)-এর পার্থক্য

ইসলামী জীবনদর্শনকে পাশ্চাত্য ফ্রেমওয়ার্কে মূল্যায়ন করা মুসলিম চিন্তাবিদদের অন্যতম ভয়াবহ ভুল। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর ভুল হলো, ইসলামে স্বীকৃত /হরুল ইবাদ' অর্থাৎ বান্দার অধিকারকে পাশ্চাত্যের 'মানবাধিকার' ধারণার সমার্থক হিসেবে উপস্থাপন করা।

উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যদি দু'জন পুরুষ পরস্পরের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে চান, তাহলে কি তাদের সেই অধিকার আছে? যদি এই প্রশ্ন কোনো ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে করা হয়, তবে তিনি 'আল্লাহর বিধান' অনুসারে উত্তর দেবেন-যেহেতু কুরআন-সুন্নাহ এ কাজে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে, সুতরাং এটি বৈধ নয়। কিন্তু একজন 'Human Rights Activist' বলবেন, যেহেতু প্রতিটি ব্যক্তি তার সুখ খুঁজে নেওয়ার অধিকার রাখে, সেহেতু যদি তারা পরস্পরের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সুখ লাভ করতে চান, তবে সেটি তাদের মৌলিক অধিকার। তারা তা করতে পারেন।

এই ভিত্তিতেই পাশ্চাত্যে সমলিঙ্গ বিবাহ, সমমত যৌনসম্পর্ক, সমকামিতা ইত্যাদিকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে। কারণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র 'মানবাধিকারের' সংজ্ঞাকে সর্বোচ্চ আইন হিসেবে গ্রহণ করে এবং এই অধিকার রক্ষার দায় রাষ্ট্রের বলে বিবেচনা করতে চায়।

অন্যদিকে ইসলাম বলে, কোনো কাজ বৈধ কি না, তা নির্ধারিত হয় একমাত্র আল্লাহর নির্দেশে। সুতরাং, সমাজে একজন ব্যক্তি যা ইচ্ছা তা করার অধিকার রাখে না; বরং তার অধিকার সীমিত সেইটুকুতে, যেটুকু তার রব কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে তাকে প্রদান করেছেন।

এই পার্থক্য সুস্পষ্ট: পশ্চিমা মানবাধিকার ধারণা বলে, মানুষ নিজেই নিজের মালিক, ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠি তার কামনা-বাসনা। ইসলাম বলে মানুষ আল্লাহর বান্দা, আর তার কর্তব্য আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলা।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামে কোনো "অধিকার" এমনভাবে বিদ্যমান নয় যার উৎস তার নিজের অস্তিত্ব বা স্বাধীন ইচ্ছা; বরং প্রতিটি অধিকার আল্লাহর দেওয়া সীমারেখার মধ্যেই কেবল বৈধ হতে পারে। ফলে যে কাজ আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন, তা মানবিক 'স্বাধীনতা'র নামে বৈধ করা ইসলাম স্বীকার করে না।

[২] সর্বজনীন মানবাধিকার: আধিপত্যের হাতিয়ার না আত্মবিস্মৃতির ফাঁদ?

আসলে "কল্যাণ" তথা 'ভালোর' সংজ্ঞায় লিবারেল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রও ঠিক ততটাই একরোখা ও সহিষ্ণুতাহীন, যতটা কোনো ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র হতে পারে। কেননা, উভয় রাষ্ট্রই তাদের নিজ নিজ 'কল্যাণ'-এর ধারণার বাইরে কোনো ভিন্ন তত্ত্ব বা দৃষ্টিভঙ্গির আধিপত্যকে সহ্য করতে চায় না। এই সত্যই প্রতিফলিত হয় যখন বিখ্যাত লিবারেল চিন্তাবিদ জন রলস বলেন: "*ধর্মীয় স্বাধীনতা যদি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, তা লিবারেল আদর্শের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়, তখন সে স্বাধীনতা আর বরদাস্ত করা যাবে না। এমনসব ধর্মীয় মতবাদ, যা ব্যক্তি-স্বাধীনতার ধারণাকে অস্বীকার করে, সেগুলিকে দমন করা ততটাই জরুরি, যতটা কোনো সমাজের চরম যেকোন হুমকি দমন করা জরুরি হয়।*"।

অতএব, সবধরনের 'কল্যাণ'-এর সমান মর্যাদা বা নিরপেক্ষতার দাবি আসলে কখনোই সত্যিকারের নিরপেক্ষতা নয়-এটা 'সকল মতের সমান স্বাধীনতা'র নামে একটি নির্দিষ্ট মতের একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সুচতুর কৌশল।

৩. মানবাধিকার ও গণতন্ত্র কি ইসলামী আধিপত্যের পথ?

অনেক ইসলামপন্থী চিন্তাবিদ ও আলিম মনে করেন, মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের কাঠামো ইসলাম প্রতিষ্ঠার একটি কার্যকর উপায় হতে পারে। কিন্তু তারা বোঝে না, এই ধারণা এক নিগূঢ় বিভ্রান্তির ফল। তারা ধরে নেন, মানবাধিকার ও গণতন্ত্র হচ্ছে এমন এক নিরপেক্ষ ও প্রযুক্তিগত কাঠামো, যা যে-কোনো 'কল্যাণ'-এর দিকে অগ্রসর হতে সাহায্য করতে পারে। অথচ বাস্তবে মানবাধিকার ও গণতন্ত্র এমন রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলে, যার ভিত্তি আল্লাহর ইচ্ছা

নয় বরং মানব-ইচ্ছার সর্বোচ্চতা। এই কাঠামোকে 'কল্যাণের বহুত্ব' (plurality of goods) নাম দিয়ে সৌন্দর্যময় করে তোলা হলেও বাস্তবে এর পরিণতি লিবারেল পুঁজিবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব, এই কাঠামোকে স্বীকার করা মানেই ইসলামের পরাজয় মেনে নেওয়া।

এই আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ইসলামী আন্দোলন ও কিছু আলিমসমাজের যে কৌশল আমরা জানি, অর্থাৎ তারা সাংবিধানিক অধিকারকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে ইসলাম রক্ষা করতে চেয়েছেন-তা আসলে একটি ভুল কৌশল। যখন রাষ্ট্রীয় বা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ইসলাম ও তার শিক্ষার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেয়, তখন তার প্রতিবাদ করা হয় 'মুসলমানদের অধিকার' নামে। যেমন, যদি তুরস্ক সরকার মুসলিম নারীদের হিজাব নিষিদ্ধ করে, তখন বলা হয়-এটা মুসলমান নারীর 'মানবাধিকার' লঙ্ঘন।

এই যুক্তির মূল ভিত্তি যদি ইসলামের পরাজিত অবস্থা না হয়ে কোনো চিন্তাগত দৃষ্টিভঙ্গি হয়, তাহলে ইসলামকে 'পরম কল্যাণ' হিসেবে নয় বরং নিছক ব্যক্তিগত 'অধিকার' হিসেবে তুলে ধরা হয়। এতে ইসলামের 'পরম কল্যাণ' ও 'সমগ্র জীবনব্যবস্থা' হওয়ার ধারণারই অবসান ঘটে। কেননা, যখন ইসলামী চিন্তা কেবল একটি 'ব্যক্তিগত মতামত' হিসেবে উপস্থাপিত হয়, তখন অন্য সব মত ও পথকেও সমান মর্যাদা দিতে হয়। এক্ষেত্রে, 'আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার' অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের কোনো ভিত্তিই আর অবশিষ্ট থাকে না।

এই কৌশল আমাদের শেষমেশ ইসলামকে 'পরম সত্য' নয় বরং 'বহু সত্যের' ভিড়ে একটি সাধারণ 'মত' হিসেবে রক্ষা করার সুযোগ দেয় এবং ধীরে ধীরে ইসলামকে লিবারেল কাঠামোর অভ্যন্তরে একীভূত করে ফেলে। মানবাধিকার কখনোই ইসলামী আধিপত্যের পথ হতে পারে না, কারণ এটি যতটা ইসলাম প্রকাশের স্বাধীনতা দেয়, ঠিক ততটাই কুফর ও পাপাচারেরও নিরাপত্তা দেয়।

নিশ্চয় মানবাধিকার কাঠামো ধর্মীয় স্বাধীনতার সুযোগ দেয়, কিন্তু এই স্বাধীনতা কেবল একটি সীমিত গণ্ডির মধ্যে ইসলামকে আবদ্ধ রাখে। ধর্মীয় স্বাধীনতার এই বাস্তব রূপ না বোঝার কারণে মুসলিম চিন্তাবিদ ও আলিমসমাজ দুটি মারাত্মক ভুলের শিকার হয়েছেন।

পাকিস্তান ও তুরস্কে ইসলামপন্থীদের গণতান্ত্রিক লড়াই এই সত্যের জ্বলন্ত প্রমাণ।

ইসলামী আন্দোলনগুলো শেষ পর্যন্ত কল্যাণের রাজনীতি নয়, বরং 'অধিকার'-ভিত্তিক রাজনীতির আশ্রয় নেয়। কারণ গণতান্ত্রিক কাঠামোয় 'অধিকার'-কে ছাড়িয়ে অন্য কোনো ধারণার কথা বলা একপ্রকার অর্থহীন হয়ে পড়ে। এই অধিকারনির্ভর রাজনীতির ফলে দেখা যায়, ইসলামী দলগুলো নির্বাচনের আগে ও পরে এমন সব কথা বলতে বাধ্য হয়, যা ঘুরেফিরে মূলত ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলোরই কর্মসূচি। যেমন, করাচি বা খাইবার প্রদেশে তাদের নিয়ন্ত্রিত সরকারের অভিজ্ঞতা থেকেই এটা পরিষ্কার-তাদের এজেন্ডা কেবলমাত্র বিচার বিভাগ, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, দ্রব্যমূল্য, বেকারত্ব ও বিদ্যুৎ সংকট নিরসনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। ইসলাম পুনরুজ্জীবনের স্বপ্ন সেখানে নিছক একটি নিরীহ শ্লোগানে পরিণত হয়েছে।

৪.মানবাধিকার: সর্বোত্তম বলে দাবি ও বাস্তবতার খোঁজ

মানবাধিকার বা "হিউম্যান রাইটস"-এর কাঠামো আসলে কোনো আধ্যাত্মিক বা শাশ্বত সত্যের প্রতিফলন নয়; এটি নিছক উত্তর-খ্রিস্টীয় পাশ্চাত্য সমাজব্যবস্থার ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক নির্মাণ। এই কাঠামোকে বুঝতে হলে এর সুনির্দিষ্ট পটভূমি উপলব্ধি করতে হবে। মানবাধিকার ধারার যৌক্তিক ভিত্তি কোনো সার্বজনীন যুক্তি বা অবিকল প্রমাণ নয়; বরং একটি কল্পিত ধারণার উপর স্থাপিত-যা হলো "মানবপ্রকৃতি" (Human Nature)। অর্থাৎ, এর সারাংশ এই যে, মানবাধিকার আসলে মানুষের প্রকৃতিগত দাবির প্রতিফলন। এই যুক্তি বাহ্যত খুব মহৎ ও আকাশচুম্বী শোনালেও আসলে এটি কেবলই অন্তঃসারশূন্য মোহ; কারণ "মানবীয় প্রকৃতি" বলতে আমরা যা বুঝি, তার পেছনে এক গভীর ভাববাদী (metaphysical) বিশ্বাস লুকিয়ে থাকে- যে বিশ্বাস মানুষের স্বরূপ নির্ধারণ করে দেয়।

মানবাধিকার ধারণাটি আসলে সেই 'মানব'-এর প্রকৃতিগত চাহিদার প্রতিফলন, যে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বনির্ভর অস্তিত্ব বলে মনে করে। পাশ্চাত্য চিন্তায় "নফসে আম্মারা"-অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও কামনাকে অনুসরণ করাকেই মানব প্রকৃতি এবং যুক্তির দাবি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। তাই মানবাধিকারকে তারা স্বাভাবিক ও সার্বজনীন পাওনা বলে মনে করে।

কিন্তু আমরা জানি, প্রবৃত্তির অনুসরণ নিঃসন্দেহে মানুষের একটি ক্ষমতা (ability) বটে, কিন্তু সেই অর্থে নয় যে, এটি কোনো প্রশংসনীয় বা প্রকৃত (normal) মানবীয় গুণ। মানুষের মধ্যে যেমন শ্রেষ্ঠত্বের সম্ভাবনা আছে, তেমনি নিচে গড়ানোরও প্রবণতা রয়েছে। কিন্তু এই নিচে গড়ানোর প্রবণতাকে "প্রকৃতি" বলা ন্যায়সঙ্গত নয়। পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গিতে নফসে আম্মারাকেই মানব প্রকৃতির মাপকাঠি ধরা হয়, কারণ তাদের ঈশ্বর-সংক্রান্ত ধারণাটিও এই প্রবৃত্তির

ইচ্ছাকে কেন্দ্র করেই গঠিত। এ কারণে পাশ্চাত্য জ্ঞানে আইন, চুক্তি ইত্যাদির জায়গা আছে, কিন্তু "পাপ"-এই মৌলিক ধর্মীয় ধারণার স্থান নেই। **পাপ কী? পাপ হলো, যখন মানুষ নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহর ইচ্ছার উপর স্থাপন করে।** পাশ্চাত্যে এই "স্বাধীন ইচ্ছা"ই মহত্তম গুণ বলে বিবেচিত। অথচ ধর্মীয় দৃষ্টিতে কল্যাণের অর্থ হলো, মানুষ আল্লাহর আদেশ পালনের মধ্যেই শান্তি ও পূর্ণতা খুঁজে ফিরবে। আর এই গুণসম্পন্ন মানুষই "নফসে মুতমাইন্না"-যে স্বীয় প্রভুর আদেশে সন্তুষ্ট হয়ে জীবন যাপন করছে।

পুঁজিবাদ (Capitalism)-এর পক্ষে যুক্তি হিসেবে বলা হয় যে, এটি মানব প্রকৃতির অনিবার্য ফলাফল এবং ইতিহাসের অপরিহার্য গতি। কিন্তু বাস্তবে পুঁজিবাদ কোনো যৌক্তিক বা প্রকৃতিগত বিষয় নয়, বরং নফসের লালসা, হিংসা ও শোষণের একটি সামাজিক পরিণতি। পাশ্চাত্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (Individualism)-যার কেন্দ্র "হিউম্যান বিয়িং"-এর মূল বিশ্বাস হলো স্বাধীনতা, আর তা প্রকৃতপক্ষে রবের প্রতি বিদ্রোহ। এ জাতীয় চিন্তাশীলদের ভিত্তি গঠিত হয় আত্মোদ্দীপনা, ক্রোধ, হতাশা ও দুঃখবোধের মতো মানসিক অবস্থার মধ্য দিয়ে। যেমন ফিলোসোফার কিয়ার্কেগার্ড বলেন, আদম (আ.) জান্নাতে নিঃসঙ্গতায় ভুগছিলেন বলেই পাপ করেছিলেন। পাশ্চাত্যে এই "নিঃসঙ্গতা" ও "বিচ্ছিন্নতা"কেই মানব অস্তিত্বের সারমর্ম বলে মানা হয়।

৫.মানবাধিকার: একটি ভিন্ন সভ্যতাগত দৃষ্টিভঙ্গি

মানবাধিকারকে কোনো ধর্মীয় জ্ঞানতত্ত্ব, সংস্কৃতিক পরম্পরা বা নৈতিক আদর্শ থেকে উদ্ভূত ধারণা হিসেবে বিবেচনা করা হয় না; বরং এগুলোকে এমন স্বয়ংসম্পূর্ণ অধিকার রূপে স্থাপন করা হয়েছে, যেগুলো নিজের মধ্যেই নিজের যৌক্তিকতা বহন করে। এদের বৈধতা কোনো বিশেষ নৈতিক সূত্র-যেমন ধর্ম, রীতি বা ঐতিহ্যের ওপর নির্ভর করে না।।

প্রখ্যাত আমেরিকান চিন্তাবিদ থমাস জেফারসন বলেন:

"We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal; that they are endowed by their Creator with inherent and inalienable rights; that among these, are life, liberty, and the pursuit of happiness."

"আমরা এই সত্যগুলোকে এমন স্বতঃসিদ্ধ বলে গণ্য করি, যা সকল মানুষের স্বত্বাধিকার হিসেবে জন্মগতভাবে প্রাপ্ত; স্রষ্টা তাদেরকে কিছু অবিচ্ছেদ্য অধিকার দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে: জীবন, স্বাধীনতা এবং (নিজ ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী) সুখান্বেষণের অধিকার।"(১)

এই ঘোষণার তাৎপর্য হলো, মানবাধিকার এমন এক বিমূর্ত ধারণা, যাকে ধর্ম, জাতি, সংস্কৃতি, লিঙ্গ বা ব্যক্তিগত চরিত্রের প্রেক্ষিতে পরিবর্তনযোগ্য ধরা হয় না।

মানবাধিকার দর্শনের মূলে যে চিন্তা রয়েছে, তা হলো: সামাজিক ন্যায়ের ভিত্তি রচনার জন্য সবধরনের নৈতিক মূল্যবোধের ঊর্ধ্বে উঠে অধিকার নির্ধারণ করতে হবে। অর্থাৎ, কোনো বিশেষ ও সীমিত "تصور خير" বা "মহত্ত্বের সংজ্ঞা" থেকে অধিকার গ্রহণ বা ব্যাখ্যা করা যাবে না।

ফলে যখন আমরা বলি, "আমরা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে মানবাধিকার নির্ধারণ করব", তখন নিজের অজান্তেই আমরা দ্ব্যর্থক বক্তব্য দিচ্ছি। কেননা, কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক যে অধিকারতত্ত্ব হবে, তা অবশ্যম্ভাবীভাবে একটি নির্দিষ্ট নৈতিক ভিত্তি তথা ইসলামি আদর্শের প্রতিফলন হবে। একে "হক্কুল ইবাদ" বলা যেতে পারে, কিন্তু "হিউম্যান রাইটস" বলা যায় না।
মানবাধিকার একটি নির্দিষ্ট জ্ঞানতাত্ত্বিক ও সভ্যতাগত পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত পরিভাষা। কোনো পরিভাষা কেবল শব্দ নয়; তা একটি দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করে। হিউম্যান রাইটস"ও একটি পশ্চিমা তাত্ত্বিক সভ্যতার পরিভাষা।

মানবাধিকার কিংবা গণতন্ত্র, এই ফ্রেমওয়ার্ক কোনোভাবেই ইসলামের ইতিহাস ও জ্ঞানতত্ত্ব থেকে উদ্ভূত নয়। কিন্তু যখন আমরা এই ধারণার সার্বজনীনতা মেনে নিয়ে ইসলামী ইতিহাসকে তার আলোকে যাচাই করতে যাই, তখন একদিকে এই সার্বজনীনতার দাবিকে শক্তি দিচ্ছি, অন্যদিকে নিজেদের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলছি। তখন হয় আমরা আত্মরক্ষামূলক অবস্থান নিয়ে কোনো আপসের পথে হাঁটব, নয়তো নানা অযৌক্তিক ব্যাখ্যায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলব।।

পশ্চিম যেভাবে "আলোকপ্রাপ্তি" (এনলাইটেনমেন্ট) আন্দোলনের মাধ্যমে খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রভাব ভেঙে দিয়েছিল, তারা তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তায় কোনো খ্রিস্টীয়

পরিভাষা টিকিয়ে রাখেনি। তারা তাদের নতুন ধারার জন্য সম্পূর্ণ নতুন পরিভাষা ও তাত্ত্বিক কাঠামো দাঁড় করিয়েছে।

একইভাবে, যখন ঔপনিবেশিক শক্তি মুসলিম বিশ্বে খিলাফতের অবসান ঘটায়, তখন তারা "গণতান্ত্রিক খিলাফত" বা "পশ্চিমি খিলাফত" নামে কিছু চালু করেনি। বরং তারা তাদের নিজস্ব সভ্যতাগত ধারায় নির্মিত "ডেমোক্রেসি" বা "গণতন্ত্র" কেই পরিচয় করিয়ে দিয়েছে।

তবে প্রশ্ন থেকে যায়: আমাদের বুদ্ধিজীবীরা কেন এমন সাহস দেখাতে পারছেন না যে, তারা পাশ্চাত্য পরিভাষাকে প্রত্যাখ্যান করে ইসলামী ধারণাগুলোর প্রচারে অটল থাকবেন?

আমাদের এমন কিছু চিন্তক, যারা নতুন করে দ্বীনের ব্যাখ্যায় আগ্রহী, তাদের আত্মবিস্মৃতির নমুনা হলো, তারা "ফিকহ" শব্দটি বাদ দিয়ে সর্বত্র "আইন" ব্যবহার করেন। যেমন: 'আইনুল ইবাদাত', 'আইনুল মুআশারাত' ইত্যাদি। অথচ "আইন" শব্দটি "ফিকহ" নামক ব্যাপক ও বহুস্তর বিশ্লেষণভিত্তিক পরিভাষার পূর্ণতা ও সূক্ষ্মতার ধারেকাছেও পৌঁছায় না। "আইন" যদি হয় একটি কণার নাম, "ফিকহ" যেন এক মহাবিশ্ব।।

৬. মানবাধিকার ও নৈতিকতার অবসান

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, মানবাধিকার বলতে মূলত ধর্মীয় মূল্যবোধ ও ইসলামী নৈতিকতার অস্বীকারকে বোঝানো হয়।

কারণ নৈতিকতা ও মূল্যবোধ অনুধাবনের জন্য অপরিহার্য হলো, মানুষ তার আকাঙ্ক্ষাগুলোর মধ্যে একটি অগ্রাধিকারভিত্তিক মানদণ্ড নির্ধারণ করতে পারবে; অর্থাৎ সে নিজেকে এই প্রশ্নটি করতে পারবে-আমার কী চাওয়া উচিত আর কী নয়? কোনটি আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ আর কোনটি গৌণ?" কিন্তু মানবাধিকার-ভিত্তিক চিন্তাচেতনা অনুযায়ী এই প্রশ্নটিই অবান্তর, কারণ এই মতবাদ অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তি তার ইচ্ছার অনুক্রম নিজে নির্ধারণ করতে স্বাধীন, এবং সকল ধরনের আকাঙ্ক্ষার গুরুত্ব এখানে সমান বলে ধরে নেওয়া হয়।

লিবারেল দার্শনিক জন রোলস (Rawls) বলেন- "তুমি যা চাও, সেটাই সঠিক," অর্থাৎ মানুষের যে কোনো ইচ্ছাকে শেষ কথা হিসেবে মেনে নিতে হবে। তার মতে, আমরা কখনোই

বলতে পারি না, 'মানুষের কী চাওয়া উচিত'; বরং প্রত্যেকেই তার চাওয়ার অধিকারে সমানভাবে স্বাধীন। এর মানে, আমাদের কোনো চূড়ান্ত জ্ঞান নেই যা নির্দেশ করে যে, কোনো আকাঙ্ক্ষা আমাদের জন্য আদতেই কাম্য কি না। অতএব, মানুষ যত বেশি এই পৃথিবীতে কর্তৃত্ব বিস্তার করবে, তত বেশি সে নিজের ব্যাপারে 'স্বাধীনতার' দাবি করতে পারবে।

এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত জীবনে যা কিছু কামনা করতে চায় তা করতে পারে-এই শর্তে যে, তার কামনা 'স্বাধীনতার মূলনীতি'-র বিরোধিতা করতে পারবে না। ফলে মানবাধিকার মতে, নৈতিকতার ভিত্তি শুধু মানুষের ইচ্ছা; কোনো কিছুর মূল্য নির্ধারণ হয় এই বিবেচনায় যে, মানুষ কতটা তীব্রভাবে সেটি কামনা করে বা চায়।

জাঁ-পল সার্তের ভাষায়, "মূল কথা তুমি কী চাও তা না, বরং কীভাবে চাও, সেটা।" অর্থাত যদি কোনো ব্যক্তি জেনায় বেশি আনন্দ পায় আর পাঠে কম, তবে তার কাছে জেনার মূল্য পাঠের চেয়ে বেশি হবে। তবে সে স্বীকার করবে যে, অন্য কেউ পাঠে বেশি আনন্দ পেলে তার কাছে পাঠের মূল্য জেনার চেয়ে বেশি হতে পারে।

এই মানদণ্ড অনুযায়ী, জীবনের যে কোনো কিছুকে 'মূল্যবান' বিবেচনা করার ব্যাপারে ব্যক্তি স্বাধীন-কিন্তু শর্ত হলো, প্রত্যেক মানুষকেই এই মূল্য নির্ধারণের একইরকম অধিকার দিতে হবে। অথচ, আত্মার ভেতরে বসবাসকারী 'নফসে লাওয়ামা' (অসন্তুষ্ট আত্মা) কেবল তখনই ব্যক্তি চাওয়াকে যাচাই করতে সক্ষম হয়, যখন তা আল্লাহর বিধান অনুসারে মাপা হয়। আর যদি মানুষ সেই ঐশী নির্দেশ অস্বীকার করে, তবে আত্মা ও প্রবৃত্তির মধ্যকার ভারসাম্য ভেঙে পড়ে, এবং 'নফসে আম্মারা' (পাপপ্রবণ আত্মা) পুরোপুরি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে নেয়।

সত্যিকার অর্থে, "তুমি যা চাও তাই করো"-এই বাক্য যখন সামাজিক বিধিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তার তাৎপর্য হয়, অপরের জন্যও সেই চাওয়ার অধিকার স্বীকার করো। আর এর অর্থ দাঁড়ায়, নৈতিকতার সমূলে অস্বীকার করা।

এই দর্শন আসলে প্রবৃত্তির পূজা, যার ফলে সমাজে সেই সব লজ্জাহীনতা ও বিকৃতি প্রকাশ ও প্রচার পায়, যা ধর্মীয় সংস্কৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত।

বলতে হয়, কোনো সমাজে কি একসাথে সজ্জা ও নির্লজ্জতা, আল্লাহভীতি ও প্রবৃত্তিপূজা, আখিরাতের ভাবনা ও দুনিয়ামুখিতা, সংযম ও লোভ, শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা ও মৃত্যুভীতি, পরিতোষ্ঠি ও হিংসা-এ সমস্ত বৈপরীত্য একত্রে বিকশিত হতে পারে?

নৈতিকতা তো কেবলই নবীজি -র আদর্শ, শরিয়ত ও তাসাউফের প্রচার এবং প্রতিষ্ঠা। স্পষ্টত, মানবাধিকার সেই সবের ওপরেই চূড়ান্তভাবে তার প্রাধান্য দাবি করে।

আখেরি কথা হলো, আম্বিয়ায়ে কেরামের শিক্ষার বাইরে এমন কোনো জ্ঞানের উৎস নেই, যা মানুষকে জানাতে পারে, কী তার চাওয়া উচিত আর কী নয়। তেমনি শরিয়তের বাইরে কোনো কল্যাণ বা নৈতিকতার ভিত্তি পৃথিবীতে নেই। (১)

(১) মাকালাতে তাফহিমে মাগরিব ১০০-১২০ পৃ.

মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক সনদ: এখনো অসম্পূর্ণ ও অপূর্ণ

বিশ্বের জাতিগোষ্ঠীগুলোর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় রচিত এই সর্বজনীন মানবাধিকার সনদটিকে আধুনিক যুগের সর্বশেষ ও চূড়ান্ত চার্টার হিসেবে গণ্য করা হয়। বিশ্বজুড়ে প্রচলিত ঐশী, অনৈশী, আঞ্চলিক এবং জাতীয় সংবিধান ও আইনের আলোকে একে রূপায়িত করা হয়েছিল। অর্ধশতাব্দীর বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও তাৎপর্য, প্রয়োগ ও কার্যকারিতার দিক থেকে সনদটি আজও সুস্পষ্টভাবে অপূর্ণ ও অপর্যাপ্ত থেকে গেছে। এ বিষয়ে কেবল পূর্ব কিংবা পশ্চিম নয়, বরং উভয় দিকের চিন্তাবিদগণ অভিন্ন অনুভূতিতে পৌঁছেছেন।

১৯৭০ সালে পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ রবার্ট ই. ডিউই গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন: "প্রায় দুই শতাব্দী আগে, বিপ্লবাত্মক কোনো এক অস্থির সময়ে-যার সঙ্গে বর্তমান সময়ের তীব্র সাদৃশ্য রয়েছে- থমাস পেইন তাঁর সমসাময়িকদের উদ্দেশে একটি কঠোর বাস্তবতা তুলে ধরে বলেছিলেন: স্বাধীনতা এখন বিশ্বময় ঘুরে বেড়াচ্ছে; তাকে ধরে ফেল এবং মানবজাতির জন্য একটি চিরস্থায়ী আশ্রয় তৈরি করো।'

কিন্তু দুঃখজনকভাবে আজও, অসংখ্য ঘোষণাপত্র, সনদ ও মধুর ভাষণের পরেও স্বাধীনতা অধরা। আমেরিকা হোক বা রাশিয়া, পর্তুগাল হোক বা অ্যাঙ্গোলা, ব্রিটেন হোক বা রোডেশিয়া, বোস্টন হোক বা মিসিসিপি-স্বাধীনতার অস্তিত্ব কোথাও নেই।" (১)

সর্বজনীন মানবাধিকার সনদের বিষয়ে বিখ্যাত আইনতত্ত্ববিদ হ্যান্স কেলসনের মন্তব্য গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন: "শুধু আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায়, এই সনদের অনুচ্ছেদসমূহ কোনো রাষ্ট্রকে এর ঘোষিত অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা করার ক্ষেত্রে আইনগত বাধ্যবাধকতার আওতায় আনে না। সনদের ভাষা ও কাঠামো এমনভাবে রচিত যে, সদস্য রাষ্ট্রগুলো জনগণকে এসব অধিকার প্রদানে আইনিভাবে দায়বদ্ধ নয়।"(২)

কার্ল ম্যানহেইম আরেক ধাপে বলেন: "এই সনদ কোনো ব্যক্তিকে এমন আইনি অধিকার দেয় না, যার বলে তিনি তাঁর অধিকার লঙ্ঘিত হলে আন্তর্জাতিক বিচার আদালত বা জাতিসংঘের কোনো উচ্চতর ন্যায়বিচার সংস্থার শরণাপন্ন হতে

(১) Dewey Robert E. "Freedom" The Macmillon Company, (১৯৭০) P. ৩৪৭

(২) Hans Kelson: The Law of United Nations, London, ১৯৫০ P. ২৯

পারেন। সনদের ৩৪ নম্বর অনুচ্ছেদ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়, কেবল রাষ্ট্রগুলোই আন্তর্জাতিক আদালতের পক্ষ হিসেবে হাজির হতে পারে, কোনো ব্যক্তি নয়। "(১)

অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের প্রশ্নে বিশ্লেষক ড. রাফায়েল পর্যবেক্ষণ হাজির করেন: "এই তথাকথিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারগুলো কোনো আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করে না। এসব অধিকারের অর্থ নিছক কিছু সুবিধা প্রদানের প্রত্যাশা-যেমন: ন্যায্য আয়, শিক্ষা ও সামাজিক সুরক্ষা ইত্যাদি। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এসব সুবিধা প্রদানের দায়িত্ব কার? কার ওপর এই কর্তব্য আরোপ করা হয়েছে?

জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদে বলা হয়, সমাজের প্রতিটি সদস্যকে পূর্ণ সামাজিক সুরক্ষা প্রদান করা হবে। কিন্তু এর অর্থ কী? এর অর্থ কি এই যে, প্রতিটি ব্যক্তি একটি বৈশ্বিক সুরক্ষা ব্যবস্থায় অবদান রাখবে, যেন প্রয়োজন হলে সেখান থেকে উপকৃত হতে পারে?

যদি এটাই তাদের বক্তব্য হয়ে থাকে, তবে কেন এই সনদ প্রয়োগকারী চুক্তিগুলোতে এমন কোনো ধারা নেই যা এই কাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে পারে? কোনো কার্যকর কাঠামো না থাকলে আইনগত বাধ্যবাধকতার প্রশ্নই আসে না। মানুষের ওপর এমন কিছু চাপিয়ে দেওয়া যা তার সাধ্যের বাইরে, তা যেমন একপ্রকার অযৌক্তিকতা, তেমনি আরও বড় বোকামি হলো, মানুষকে এমন কিছু অধিকার প্রদানের প্রতিশ্রুতি উচ্চারণ করা, যেগুলো থেকে সে কোনো বাস্তব উপকার পায় না।"(২)

সংবিধানবিদ্যার দূরদর্শী চিন্তক প্রয়াত এ. কে. ব্রোহি মন্তব্য করে বলেন: অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার-সংক্রান্ত চুক্তিতে যেসব অধিকার বিবৃত হয়েছে, সেগুলো প্রচলিত অর্থে 'অধিকার' নয়; বরং সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতিমালার প্রতিফলন মাত্র। এ কারণেই শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষকে দুটি পৃথক ও স্বতন্ত্র চুক্তি প্রস্তুত করতে হয়েছে।"(৩)

উপরের মন্তব্যসমূহ স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, মানুষের সম্মিলিত আন্তর্জাতিক প্রয়াস সত্ত্বেও মানবজাতির জন্য শান্তি ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন নিশ্চিত করা যায়নি। জনৈক পর্যবেক্ষকের ভাষায়: "এই মানবাধিকার সনদ মূলত একটি চমৎকার
দলিলমাত্র। এখানে মানুষের নানা অধিকার তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, কিন্তু কোনো অধিকার কার্যকর করার পেছনেই বাস্তবিক বল প্রয়োগের ক্ষমতা রাখা হয়নি।" (৪)

(১) Karl Mannheim: Diagonsis of Our Time, London ১৯৪৭ ০.১৫

(২) Political Theory and the Rights of Man: Raphael D. D, Indiana University

Press. Bloomington, ১৯৬৭, P. ৯৬

(৩) Brohi A. K. United Nations and the Human Rights (১৯৬৮) P. 88

(৪) S. Salauddin: Bunyadi Huquq P. ৮৯ (MMI Publishers, New Delhi ১৯৮৯)

ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার অধিকার

ইসলামী আইন ব্যক্তিগত স্বাধীনতার নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং কাউকে তার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করার অধিকার অন্য কারো হাতে তুলে দেয় না-বিশেষত মিথ্যা অভিযোগ কিংবা পূর্ণাঙ্গ তদন্ত ছাড়াই কেউ যেন কারো স্বাধীনতা হরণ না করে, তা নিশ্চিত করা হয়েছে। একজন অভিযুক্ত ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার রাখেন এবং বাদীকে বাধ্য করতে পারেন যেন সে জনসমক্ষে, সুনির্দিষ্ট আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তার অভিযোগ উত্থাপন করে।

এই অধিকার অর্থাৎ, কোনো অভিযুক্তকে আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে তার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আর কোনো বিচারিক রায় তখনই প্রকৃত ন্যায়বিচার হিসেবে গণ্য হবে, যখন অভিযুক্তকে আত্মরক্ষার সকল সুযোগ ও উপায় প্রয়োগ করার পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হবে।

পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে-

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا . بِالْعَدْلِ : إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

(হে মুসলিমগণ!) নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ তার হকদারকে আদায় করে দেবে এবং যখন মানুষের মধ্যে বিচার করবে, তখন ইনসাফের সাথে বিচার করবে। নিশ্চিত জেন, আল্লাহ তোমাদেরকে যে বিষয়ে উপদেশ দেন, তা অতি উৎকৃষ্ট হয়ে থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন। (১)

কুরআনে আরও এসেছে-

فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ] من كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

(হে রাসূল!) তুমি ওই বিষয়ের দিকেই মানুষকে ডাকতে থাক এবং তুমি অবিচলিত থাক (এ দ্বীনের উপর), যেমন তোমাকে আদেশ করা হয়েছে। আর তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ

করো না। বলে দাও, আমি তো আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন তার প্রতি ঈমান এনেছি আর আমাকে তোমাদের মধ্যে ইনসাফ করতে আদেশ করা হয়েছে। আল্লাহ আমাদের রব্ব এবং তোমাদেরও রব্ব। আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে (এখন) কোন বিতর্ক নেই। আল্লাহ আমাদের সকলকে একত্র করবেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরই কাছে সকলকে ফিরে যেতে হবে।(২)

(১) সূরা আন-নিসা ৪:৫৮

(২) সূরা আশ্ -শূরা ৪২:১৫

বিখ্যাত ফকিহ কাজি আবু ইউসুফ (রহঃ) লিখেছেন: "শুধুমাত্র অভিযোগের ভিত্তিতে কাউকে কারাগারে প্রেরণ করা সম্পূর্ণ ভুল ও হারাম। রাসূলুল্লাহ কখনো কাউকে নিছক অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করেননি। এ ধরনের পরিস্থিতিতে বাদী ও বিবাদী-উভয়কে আদালতে হাজির করতে হবে। যদি বাদী প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেন, তবে রায় তার অনুকূলে যাবে। যদি না পারেন, তবে বিবাদীকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হবে। পরবর্তীতে যদি বাদী যথোপযুক্ত প্রমাণ পেশ করেন, তবেই বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা যাবে। অন্যথায়, অভিযুক্তকে আর স্পর্শও করা যাবে না।"(১)

(১) ইসলামি রিয়াসাত, আমিন আহসান ইসলাহি ২৩ পৃ.

ধর্মীয় স্বাধীনতা

ইসলামি রাষ্ট্রের সীমার ভেতরে বসবাসকারী প্রতিটি নাগরিকের জন্য ধর্ম বিশ্বাসের স্বাধীনতা স্বীকৃত। প্রত্যেকেই নিজের পছন্দমতো বিশ্বাস গ্রহণ এবং ধর্ম পালন করতে পারে।

যদিও ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম এবং এর মধ্যে রয়েছে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, তবুও কাউকে জোর করে এ ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করা যাবে না। ইসলাম প্রচারে সবসময় যুক্তি, প্রমাণ ও সদ্ব্যবহারই প্রাধান্য পাবে। বলপ্রয়োগ বা সামাজিক চাপে ইসলাম গ্রহণ করানোর কোনো স্থান নেই। কুরআন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِ□□

"ধর্ম বিষয়ে কোনো জবরদস্তি নেই। সত্য পথ ভ্রান্তি থেকে সুস্পষ্টভাবে পৃথক হয়ে গেছে।" (১)

আরও বলা হয়েছে:

أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

"তবে কি তুমি মানুষকে বাধ্য করবে, যাতে তারা বিশ্বাসী হয়ে যায়?"(২)

নবি কারিম-কে কুরআন বার্তা দিয়ে বলেছে:

*فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ * لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ*

"তুমি উপদেশ দাও, তুমি কেবল একজন উপদেশদাতা। তুমি তাদের ওপর জোরজবরদস্তিকারী নও।"(৩)।

(১) সূরা আল-বাকারা, ২:২৫৬

(২) সূরা ইউনুস, ১০:৯৯

(৩) সূরা আল-গাশিয়া, ৮৮:২১-২২

ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে দাওয়াতদাতাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন তিনি সম্ভভাষায় কথা বলেন, কটূক্তি ও অপমান থেকে বিরত থাকেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে;

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ.

"তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ডাকে, তোমরা তাদের গালি দিও না।" (১)

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن

"তোমরা কিতাবিদের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হলে, উত্তম পন্থায়ই সেটা করতে পারো।" (২)

ধর্ম পরিবর্তনের স্বাধীনতা ধর্মীয় স্বাধীনতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। ইসলামে অমুসলিমদের এই অধিকার রয়েছে। তবে মুসলমানদের জন্য ধর্মত্যাগ নিষিদ্ধ। কেননা ইসলাম গ্রহণ করা হয় নিজ ইচ্ছায় ও চিন্তাভাবনার মাধ্যমে, কোনোরূপ জবরদস্তিমূলকভাবে নয়। তাই ধর্মত্যাগকে ইসলাম অবমাননার শামিল গণ্য করা হয়। নবীজির যুগে কিছু মুনাফিক ও আহলে কিতাব সকালবেলা ইসলাম গ্রহণ করে সন্ধ্যায় তা প্রত্যাখ্যান করত, যেন ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়ানো যায়। পবিত্র কুরআনে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে:

وَقَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَه

"আহলে কিতাবের একদল বলল, 'ঈমানদারদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে, তাতে দিনের শুরুতে ঈমান আনো আর শেষ বেলায় তা অস্বীকার করো।'"(৩)

(১) সূরা আল-আনআম, ৬:১০৮

(২) সূরা আল-আনকাবুত, ২৯:৪৬

(৩) সূরা আলে ইমরান, ৩:৭২

তবে ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপাসনালয়ের নিরাপত্তা বিধান, নতুন উপাসনালয় নির্মাণ, ধর্মীয় রীতিনীতির স্বাধীনতা সর্বদাই স্বীকৃত ও রক্ষিত। হজরত উমর রা. একবার একটি গির্জার কোণায় সালাত আদায় করেন। তিনি শঙ্কা করলেন, মুসলিমরা ভবিষ্যতে এই গির্জাকে নিজেদের বলে দাবি করতে পারে। তাই তিনি নিজ হাতে একটি দলিল লিখে দেন, যাতে বলা হয়, এই গির্জা খ্রিস্টানদের উপাসনার জন্য সংরক্ষিত থাকবে এবং মুসলিমরা এককভাবে সেখানে প্রবেশ করতে পারবে।'(১)

(১) আল-ফারুক আল-আযম, হাইকাল ৩০২ পৃ.

নিরাপত্তার অধিকার

ইসলামী আইনব্যবস্থায় মানুষের ব্যক্তি ও জীবনের প্রতি যে সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে, তা অতুলনীয়। প্রত্যেক মানুষের জীবনকে পবিত্র ও অপরিহার্য গণ্য করে কুরআন মাজীদে যেসব আয়াত নাযিল হয়েছে, তার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হলো:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَق□□

"তোমরা এমন কোন প্রাণ হত্যা কোরো না, যাকে আল্লাহ পবিত্র ঘোষণা করেছেন, ন্যায়সংগত কারণ ব্যতীত।" (১)

পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিতে, একজন নিরপরাধ মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা গোটা মানবজাতিকে হত্যার সমতুল্য। এই ঘোষণার মাধ্যমে ইসলাম মানবজীবনের মর্যাদাকে এক অভূতপূর্ব উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেছে-যা ধর্মীয় বিধান, নৈতিক অনুশাসন কিংবা আইন-দর্শনের গ্রন্থপুঞ্জে বিরল।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

["যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করলো- যদি না তা হত্যার বদলা হয় অথবা পৃথিবীতে ব্যাপক বিপর্যয় সৃষ্টি করবার অপরাধে হয়- তবে সে যেন পুরো মানবজাতিকে হত্যা করলো। আর কেউ যদি একটি প্রাণ রক্ষা করে, তবে সে যেন গোটা মানবজাতির জীবন রক্ষা করলো।" (২)

মানবজীবন যেকোনো অবস্থাতেই হত্যা করা ইসলামে নিষিদ্ধ। এমনকি দারিদ্র্য বা দুঃখ-কষ্টের আশঙ্কায় নিজের সন্তানকেও হত্যা করার অনুমতি এ ধর্মে নেই। পবিত্র কুরআন স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ، إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا] كَبِيرًا

"তোমরা দারিদ্র্যের আশঙ্কায় তোমাদের সন্তানদের হত্যা কোরো না; আমি তাদের ও তোমাদের জন্য জীবিকা প্রদান করবো। নিশ্চয়ই তাদের হত্যা করা একটি গুরুতর অপরাধ।"(৩)

(১) সূরা বনী ইসরাইল: ৩৩

(২) সূরা আল-মায়িদা: ৩২

(৩) সূরা বনী ইসরাইল: ৩১

জাহেলি যুগে নারীবিরোধী বর্বরতা এতটাই প্রকট ছিল যে, কন্যাশিশুদের জীবন্ত কবর দেওয়ার মতো নিষ্ঠুরতা সমাজে প্রচলিত ছিল। সেই অমানবিক সংস্কৃতি চর্চার বিরুদ্ধে কুরআনের তীব্র প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨) بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ (٩)

"সেদিন (কিয়ামত দিবসে) জীবন্ত কবর দেওয়া কন্যাশিশুকে জিজ্ঞাসা করা হবে- 'কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে?'" (১)

অন্য মানুষ তো দূরের কথা, ইসলামে কেউ নিজের জীবন পর্যন্ত নিতে পারে না, আত্মহত্যা এ ধর্মে সিদ্ধ ব্যাপার নয়। পবিত্র কুরআনের ঘোষণায় বলা হয়েছে:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"তোমরা নিজেদেরকে হত্যা কোরো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।"(২)

এই অধিকার প্রদানে ইসলাম কোন জাতি, ধর্ম, গোষ্ঠী কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠ-সংখ্যালঘুর ভেদাভেদ করে না। হাদীসে নবি কারিম (সা.) বলেন:

"র্যে ব্যক্তি একজন অমুসলিম মু'আহিদ (চুক্তিভিত্তিক নিরাপদ) ব্যক্তিকে হত্যা করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন।" (৩)

অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেন:

“যে ব্যক্তি কোনো অমুসলিম মু'আহিদকে হত্যা করবে, সে জান্নাতের সুবাসও পাবে না।" (৪)

বিশ্বের প্রচলিত আইনে জীবনের সুরক্ষা সাধারণত জন্মের পর থেকেই প্রযোজ্য হয়। কিন্তু ইসলাম এই অধিকার শিশুর গর্ভাবস্থায় থাকাকালীন সময় থেকেই প্রদান করেছে। নবী কারীম (সা.) একজন গর্ভবতী নারীর বিরুদ্ধে বারবার স্বীকারোক্তির পরও ব্যভিচারের হদ (দণ্ড) প্রয়োগ করেননি, কেবল এজন্য যে, তিনি গর্ভবতী ছিলেন। হদ প্রয়োগ করা হয়েছিল তার সন্তান জন্মগ্রহণ করে দুধ ছাড়বার পর। কারণ, তাৎক্ষণিক শাস্তি হলে গর্ভস্থ শিশুটিও অন্যায়ভাবে মৃত্যুবরণ করতে পারত।

(১) সূরা আত-তাকভীর: ৮-৯

(২) সূরা আন-নিসা: ২৯

(৩) সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৬৯১৪

(৪) সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৩১৬৬

এর মাধ্যমে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা প্রতিষ্ঠিত হলো: সমাজে অবৈধ সন্তানের জীবনও বৈধ সন্তানের মতোই পবিত্র ও সংরক্ষণযোগ্য।

ফুকাহায়ে কিরাম বলেন: গর্ভধারণের চার মাস পর, অর্থাৎ যখন ভ্রূণ মানবাকৃতি

ধারণ করে, তখন থেকেই তার জীবন সুরক্ষিত ও মায়ের হত্যা তার হত্যারূপে গণ্য। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণাও এই সত্যকে সমর্থন করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট এক ঐতিহাসিক রায়ে স্বীকৃতি দিয়েছে, গর্ভধারণের তিন মাস পরের ভ্রূণকে আইনগতভাবে মানবসত্তা হিসেবে গণ্য করা উচিত। (১)

জাতিসংঘের 'সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র'-এও জীবনের সুরক্ষার অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তবে, ইসলামের বিশদ দৃষ্টিভঙ্গির তুলনায় তা অত্যন্ত সীমিত ও অপূর্ণাঙ্গ।।

(১) সূত্র: U.S. Supreme Court Reports, October ১৯৭২

শিক্ষার অধিকার

ইসলামে শিক্ষা এমন একটি অধিকার হিসেবে স্বীকৃত, যা সকল মানুষের জন্য সমানভাবে সংরক্ষিত। জ্ঞানের সাধনা প্রত্যেকের জন্য অপরিহার্য, তা নারী হোক বা পুরুষ। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ -এর পরম পবিত্র বাণী স্মরণযোগ্য, তিনি বলেছেন-"প্রত্যেক মুসলমান, নারী ও পুরুষের জন্য জ্ঞান অর্জন করা ফরজ।" (২)

(২) সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ২২৪

যদি কেউ কারও নিকট জ্ঞান অন্বেষণ করতে চায়, তবে তার ওপর অত্যাবশ্যক কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়, সাধ্যানুযায়ী সেই ব্যক্তিকে সহায়তা করা। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে একটি সুস্পষ্ট সতর্কবাণী এসেছে, আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ

"আল্লাহ আহলে কিতাবদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন-তোমরা এ (জ্ঞানের কথা) মানুষকে স্পষ্টভাবে বলবে এবং কারো নিকট গোপন করবে না। অথচ তারা তা পিঠপেছনে নিক্ষেপ করেছিল এবং এর বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করেছিল। কতই না নিকৃষ্ট তাদের এ ক্রয়!" (১)

ইসলামের দৃষ্টিতে জ্ঞান নিছক মানবিক অধিকার নয়, বরং এক পবিত্র কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন: *"যে ব্যক্তি এমন কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হলো, যা সে জানত, অথচ গোপন করল- কিয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের লাগাম পরানো হবে।"(২)*

আরও ইরশাদ হয়েছে, নবিজি বলেন: "*যারা এখানে উপস্থিত, তারা যেন এই জ্ঞান তাদের কাছে পৌঁছে দেয়, যারা অনুপস্থিত।" (৩)*

রাষ্ট্র ও সমাজের দায়িত্ব হলো- প্রতিটি মানুষের জন্য শিক্ষা অর্জনের উপযুক্ত ও সহজ পথ তৈরি করে দেওয়া। রাসূলুল্লাহ বলেন: "*আমি তো কেবল বিতরণকারী; দানকারী তো আল্লাহ তাআলা।*" (৪)

তিনি আরও বলেন: *আল্লাহ যার জন্য কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন।"*(

মানুষ তার মেধা ও প্রকৃতির উপযোগে যে কোনো জ্ঞান ও শাস্ত্রের অনুশীলন বেছে নিতে পারে। কারণ, রাসূল বলেছেন: "*প্রত্যেক ব্যক্তিকে সেই ক্ষমতা ও প্রবণতা প্রদান করা হয়েছে, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।"(৬)*

ইসলামের চোখে জ্ঞানার্জন ইবাদতের মর্যাদা রাখে। তাই এর মাধ্যমে পার্থিব লাভ বা বিনিময়ের চিন্তা এখানে গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরং একজন শিক্ষক তার জাতির কল্যাণে সেবা প্রদান করবেন। বিনিময়ে তিনি যা পান, তা পারিশ্রমিক নয়, বরং প্রতীকী কৃতজ্ঞতা।

রাসূলুল্লাহ বলেন: "তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি, যে নিজে কুরআন শিখেছে এবং অন্যকে শিক্ষা দিয়েছে।"(৭)

(১) সূরা আলে ইমরান: ১৮৭

(২) সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং ২৬৪৯

(৩) সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৪৪০৬

(৪) সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৭৩১২

(৫) সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৭১

(৬) সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২৬৪৭

(৭) সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৫০২৭

সমতার অধিকার

ইসলামের দৃষ্টিতে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীতে বিভাজন কেবল পারস্পরিক পরিচিতির জন্যই। এসব পার্থক্য কখনোই গৌরব বা উচ্চতার মানদণ্ড হতে পারে না। **প্রকৃত মর্যাদার একমাত্র মাপকাঠি হচ্ছে আল্লাহ-ভীতি ও নৈতিক বিশুদ্ধতা।** পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*"হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর দৃষ্টিতে **সে-ই সর্বাধিক মর্যাদাবান, যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু।**"(১)*

এই চিরন্তন সত্য হযরত মুহাম্মদ (সা.) স্বয়ং তাঁর বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষণে উচ্চারণ করেছেন। বলেছেন:

"কোনো আরবের উপর অনারবের, বা অনারবের উপর আরবের, কোনো শ্বেতাঙ্গের উপর কৃষ্ণাঙ্গের, কিংবা কৃষ্ণাঙ্গের উপর শ্বেতাঙ্গের সামান্য শ্রেষ্ঠত্ব নেই-শুধুমাত্র তাকওয়া বা আল্লাহ-ভীতির ভিত্তিতেই শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হয়। তোমরা সকলেই আদমের সন্তান, আর আদম সৃষ্টি হয়েছিলেন সাধারণ মাটি থেকে।"

(১) সূরা হুজুরাত ৪৯:১৩

সমতার এই অনন্য উদাহরণ আমরা দেখতে পাই দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর শাসনামলেও। হজের মৌসুমে খ্রিষ্টান থেকে মুসলমান হওয়া এক অভিজাত ব্যক্তি, যাবিলাহ ইবনে আয়হাম আল-ঘাসসানি, একজন সাধারণ বেদুইনকে চড় মারেন। বিষয়টি যখন খলিফার দরবারে পৌঁছায়, তিনি বিচার দাবি করেন। জবাবে ঘাসসানি বলেন, "আমার ও তার কীসের তুলনা! আমি একজন রাজপুত্র, সে একজন সাধারণ বেদুইন!" খলিফা উত্তরে বলেন:

"ইসলাম তোমাকে ও তাকে সমান মর্যাদা দিয়েছে। তুমি তার চেয়ে উত্তম হতে পারো কেবল তাকওয়া ও চারিত্রিক পবিত্রতার মাধ্যমে।"

ইসলাম কেবল সমতার ঘোষণা দিয়েই থেমে থাকেনি-সাহসের সঙ্গে বিধানগত মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে নিরপেক্ষভাবে তা বাস্তবেও প্রয়োগ করেছে।

সামাজিক অবস্থানের দিক থেকেও ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। একমাত্র তাকওয়া, আল্লাহভীতি ও নৈতিকতার গুণই কাউকে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার করতে পারে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, জন্মস্থান বা সামাজিক শ্রেণির ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠত্বের কোনো দাবি ইসলাম স্বীকৃতি দেয় না।

এসব স্বীকৃত ও সার্বজনীন নীতিগুলোরই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় জাতিসংঘ ঘোষিত "মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র"-এ।

মতপ্রকাশের অধিকার

ইসলামী শরীয়ত তার সকল নাগরিকের জন্য মতামত ও মতপ্রকাশের অধিকার স্বীকৃত করেছে। প্রত্যেক ব্যক্তি যেকোনো বিষয়ে নিজের মত প্রকাশে স্বাধীন। ইসলাম কখনোই সত্য ও সুসংহত সমালোচনার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত মতপ্রকাশকে দমন করে না, বরং তা উৎসাহিত করে।

পবিত্র কুরআন প্রশংসাসূচক ভাষায় বলেছে:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ] بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُون

(হে মুসলিমগণ!) তোমরা সেই শ্রেষ্ঠতম দল মানুষের কল্যাণের জন্য যাদের অস্তিত্ব দান করা হয়েছে। তোমরা পুণ্যের আদেশ করে থাক ও অন্যায় কাজে বাধা দিয়ে থাক এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ। কিতাবীগণ যদি ঈমান আনত, তবে তাদের পক্ষে তা কতই না ভালো হত। তাদের মধ্যে কতক তো ঈমানদার, কিন্তু তাদের অধিকাংশই নাফরমান। (১)

(১) সূরা আলে ইমরান: ১১০

তবে এই স্বাধীনতা তখনই সীমিত হবে, যখন তা সত্যের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে, কিংবা সমাজে ফেতনা ও অপকর্ম ছড়ানোর উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো হবে। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে মুনাফিকদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলা হয়েছে:

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ] -وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী সকলেই এক রকম। তারা মন্দ কাজের আদেশ করে ও ভালো কাজে বাধা দেয় এবং তারা নিজেদের হাত বন্ধ করে রাখে। তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। আল্লাহও তাদেরকে ভুলে গেছেন। নিঃসন্দেহে মুনাফিকগণ ঘোর অবাধ্য। (১)

মতপ্রকাশের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা সংক্রান্ত অধিকারের অসংখ্য দৃষ্টান্ত হাদীস ও সাহাবীদের জীবন থেকে পাওয়া যায়। নবীজি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাহাবীদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন, এবং তাদেরকে উন্মুক্ত মত প্রকাশের প্রতি উৎসাহ দিতেন।

উহুদ যুদ্ধের ঘটনাই দেখুন। নবীজি -সহ অভিজ্ঞ সাহাবিদের মত ছিল শহরের ভিতরে থেকেই রক্ষা যুদ্ধ চালানো, কিন্তু হযরত হামযা (রাঃ) ও নবীন সাহাবিদের জোরালো মত ছিল বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার পক্ষে। সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকে শ্রদ্ধা করে নবীজি নিজ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। বর্ম পরিধান করে বেরিয়ে এলে তরুণ সাহাবারা লজ্জিত হয়ে তাকে নিজের সিদ্ধান্তে ফিরে আসতে বলেন। কিন্তু নবীজি বললেন: "*একজন নবী যখন বর্ম পরিধান করেন, তখন যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তা খুলে রাখা তার জন্য শোভন নয়।"* (২)।

একবার কোনো যুদ্ধে নবীজি মুসলিম সেনাবাহিনীকে একটি স্থানে অবস্থানের নির্দেশ দেন। এক অভিজ্ঞ সাহাবি জিজ্ঞেস করেন, এটি কি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে নির্ধারিত, না কি আপনার ব্যক্তিগত মত? নবীজি বলেন, "এ আমার ব্যক্তিগত মত।" তখন সাহাবি আরেকটি স্থান প্রস্তাব করেন যা কৌশলগতভাবে উত্তম ছিল। নবীজি সঙ্গে সঙ্গে তা মেনে নেন।(৩)

(১) সূরা তাওবাহ: ৬৭

(২) ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, হিফজুর রহমান সিওহারভী, পৃ. ৮৯

(৩) সিরাতুন-নবি, শিবলি নোমানি ১/২৯৫

হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর শাসনামলে এক নারী মুসলমানদের নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনা করে। সেখানকার শাসক তার সামনের দাঁত ভেঙে দেন। এ সংবাদ পেয়ে হযরত আবু বকর (রাঃ) গভর্নর মুহাজির ইবনে উমাইয়াকে চিঠি লিখে বলেন: "তুমি একজন নারীর সামনের দাঁত ভেঙে দিয়েছো, অথচ সে যদি মুসলিম হতো, তবে শুধু সতর্ক করলেই যথেষ্ট হতো। আর সে যদি একজন যিম্মি হয়, তবে আমরা তো তার শিরককেও সহ্য করি-তাহলে তার ব্যঙ্গকবিতা নিয়ে এত কঠোর হওয়া কেন? যদি আগেই জানতাম, তবে আমি তোমাকে সতর্ক করতাম। এখন তোমাকে তোমার কাজের ফল ভোগ করতে হবে।" (১)

এই ঘটনাগুলোর আলোকে স্পষ্ট বোঝা যায়, তৎকালে ইসলামী রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুরা মতপ্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতো। ঐ নারী যে ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনা করেছিল, তা অত্যন্ত আপত্তিকর হলেও নবীজির খলিফা তা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখেছিলেন।

জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা এই অধিকারের স্বীকৃতি দেয় বটে, তবে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় যে পরিপূর্ণতা ও সহনশীলতা দেখা যায়, তা সেখানে উপস্থিত নেই।

(১) সিয়াসি ওয়াসিকাযাত, ড. হামিদুল্লাহ সিদ্দিকী, পৃ. ২১৭

শেষকথা

আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে সম্মানিত করেছেন এবং আসমান ও জমিনের সকল কিছু তার কল্যাণে নিয়োজিত রেখেছেন। তিনি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে প্রেরণ করেছেন সত্য ধর্ম ও সঠিক পথের দিশারী হিসেবে-যার মাধ্যমে মানবজাতিকে নির্যাতন, শোষণ ও অন্যায়ের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা যায় এবং সকল মানুষের মাঝে সাম্য, ন্যায় ও মানবিক মর্যাদার বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়।

ইসলামের এই দাওয়াত কেবল সুনির্দিষ্ট কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের জন্য সীমাবদ্ধ নয়, বরং সমস্ত মানবজাতির জন্যই সমানভাবে নিবেদিত। এখানে জাত, বর্ণ, গোত্র, ভাষা বা শ্রেণিগত পার্থক্যের কোনো স্থান নেই। মানুষের মধ্যে মর্যাদার মানদণ্ড একমাত্র তাকওয়ার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়।

ইসলামের ভিত্তি হলো একত্ববাদ-একক আল্লাহর ইবাদত। তাঁর সঙ্গে কাউকে অংশীদার না করা এবং একমাত্র তাঁকেই রব হিসেবে গ্রহণ করা। এই বিশ্বাস মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তির পথ প্রশস্ত করে এবং মানবমর্যাদার প্রকৃত সংরক্ষক হিসেবে কাজ করে। মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস, চরিত্র ও ভূমিকা এই ন্যায়ের বার্তা বহন করে চলেছে-যা এক ভারসাম্যপূর্ণ বিশ্ব গঠনের আহ্বান জানায়। এই বিশ্বে আধ্যাত্মিকতা ও বস্তুবাদ, জ্ঞান ও বিশ্বাস, দুনিয়া ও আখিরাত পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়, বরং একে-অপরের পরিপূরক।

Mahfuza Akter
Roll: 23090121325
Batch: 2309
Islamic Online Madrasa